ইসলাম প্রচারক ভাই!
প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত দিন

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ.

অনুবাদ : জাকের উল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদনা : ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

2012 - 1433

IslamHouse.com

﴿ التوحيد أولاً يا دعاة الإسلام ﴾

« باللغة البنغالية »

الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

ترجمة: ذاكر الله أبوالخير

مراجعة: د/ محمد منظور إلهي

2012 - 1433

IslamHouse.com

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর জন্য, আমরা তারই প্রশংসা করি, তার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তার কাছেই ক্ষমা চাই। আর আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর নিকট আমাদের অন্তরসমূহের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং খারাপ আমলের পরিণতি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেবে তাকে গোমরাহ করার কেউ নাই আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করে তাকে সঠিক পথ দেখানোর কেউ নাই। আর আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার ইলাহ নাই। তিনি একক তার কোন শরিক নাই। আর আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢﴾ [سورة آل عمران: ١٠٢]

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর। আর তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা যেও না। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০২]

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا﴾ [سورة النساء: ١]

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চাও। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্নীয়তা

নষ্ট করাকে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক। [সুরা নিসা, আয়াত:১]

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١﴾ [سورة الأحزاب:70-71].

হে ঈমানদার গণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে শুদ্ধ করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহা সাফল্য অর্জন করল। [সূরা আহযাব, আয়াত: ৭০-৭১]

এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ রিসালা, যা সর্ব সাধারণ ও শিক্ষিত উভয় শ্রেণীর লোকের জন্য বিশেষ উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ। রিসালাটিতে বর্তমান সময়ের বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন শেখ মুহাম্মদ

নাছির উদ্দিন আল-আলবানী রহ. একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেন। দ্বীনের প্রতি আগ্রহী প্রতিটি মানুষের অন্তরে এ প্রশ্নটি বদ্ধমুল হয়ে আছে। যাদের চিন্তা-চেতনা সব সময় এ দ্বীনের কল্যাণে ব্যয় হয়, যারা সর্বদা এ দীনের বিভিন্ন খেদমতে নিমজ্জিত এবং যারা এ দ্বীনের ধারক-বাহক, তাদের প্রত্যেকের অন্তরে প্রশ্নটি ঘুরপাক খাচ্ছে।

প্রশ্নের সার-সংক্ষেপ হল, মুসলিম জাতির পুণর্জাগরণের উপায় কি? কি পন্থা অবলম্বন করলে মুসলিম জাতি তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরেয়ে পাবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যমিনে তাদের ক্ষমতা দেবেন এবং অন্যান্য উম্মতদের তুলনায় অধিক সম্মানী আসনে পৌছতে ও যথাযথ মর্যাদায় উন্নিত হতে পারবেন?

আল্লামা আলবানী রহ. রিসালাটিতে এ প্রশ্নের বিস্তারিত ও সু-স্পষ্ট উত্তর দেন। যেহেতু প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে জানা প্রতিটি

মুসলিমের জন্য খুবই জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমরা উত্তরটি প্রচারের ব্যবস্থা করি, যাতে সবাই এ প্রশ্নের বিশুদ্ধ সমাধান কি তা জানতে পারে। আল্লাহর নিকট আমাদের কামনা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন, এ প্রশ্নের উত্তর জানা দ্বারা আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করেন। আমরা আরও কামনা করি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন মুসলিম জাতিকে যা করলে তিনি পছন্দ করেন এবং সন্তুষ্ট হন, তা করার তাওফীক দেন এবং তা করার প্রতি হেদায়েত দেন।

তাওহীদের প্রতি গুরুত্ব দেয়া ও মনোযোগী হওয়া

প্রশ্ন: মাননীয় শেখ, বর্তমানে মুসলিম উম্মার আকীদা বিষয়ে অজ্ঞতা ও আকীদার গুরত্বপূর্ণ মাসায়েল সম্পর্কে ইলম না থাকার কারণে তাদের যে দূরাবস্থা তা আপনার অজানা নয়। এ ছাড়া বিভিন্ন মতাদর্শে উম্মতের বিভক্তি, অধিকাংশ স্থানে সালফে সালেহীনদের আকীদা বিশ্বাস অনুযায়ী ইসলামের দাওয়াত দেয়া ছেড়ে দেয়া ইত্যাদি উম্মতের অবস্থাকে আরও নাজুক করে তুলছে। বর্তমানে উম্মতের এ নাজুক পরিস্থিতি ও করুণ পরিণতি, মুখলিস বান্দা, সচেতন আলেমে দ্বীন দ্বীনের দাঈদের অন্তরে এ অবস্থার পরিবর্তন করা এবং উম্মতে মুহাম্মদীকে সংশোধন করার প্রতি এক ধরনের পিপাসা ও আগ্রহের জন্ম দিয়েছে। এ সব দায়ী ও সংস্কারকরা তাদের বিশ্বাস ও নিয়ম-নীতিতে মতানৈক্য থাকার কারণে উম্মতের বর্তমান অবস্থার সংশোধন ও তাদের দাওয়াতের

পদ্ধতি বিষয়েও বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করছে, এটিও আপনি ভালোভাবেই জানেন। বর্তমানে বিভিন্ন আন্দোলন, ইসলামী দল ও জামাত যারা যুগ যুগ ধরে মুসলিম জাতিকে সংশোধন করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু আজও কোন সফলতা ও কামিয়াবি তারা দেখতে পায়নি। বরং এ সব দল, সংগঠন ও জামাতসমূহের আকীদা-বিশ্বাস রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ, কর্ম কৌশল ও তিনি যে দ্বীন নিয়ে এসেছে তার পরিপন্থী। এটি মুসলিম জাতির বিপর্যয় ও তাদের মধ্যে অনৈক্য এবং তাদের পরস্পর দ্বন্ধের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। ফলে এ সব জামাত ও সংগঠনসমূহ মুসলিম জাতিকে এক প্রকার অনিশ্চিয়তা ও সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। বিশেষ করে যুবক শ্রেণীর বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ও সংশোধন করার বিষয়ে তাদেরকে বিপদে ফেলে দিয়েছে। একজন মুসলিম প্রচারক, যিনি নবী ও রাসূলের প্রদর্শিত আদর্শের অনুসারি, মুমীনদের পথের পথিক তিনি

অবশ্যই জানেন বর্তমান অবস্থার সংশোধন করা এবং এ অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টায় অংশগ্রহণ করা কত বড় দায়িত্ব ও আমানতদারি।

* এ সব আন্দোলন ও দল সমূহের সাথে জড়িত হওয়ার বিষয়ে আপনার উপদেশ কি?

* বর্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য উপকারি-ফলপ্রসু পন্থা ও উপায় কি?

* কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনর দরবারে একজন মুসলিম কিভাবে দায়মুক্ত হবে?

উত্তর: প্রথমে তাওহীদের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। নবী ও রাসূলের মূলনীতি হল, তারা প্রথমে তাদের উম্মতকে তাওহীদের দাওয়াত দিতেন। প্রশ্নে উম্মতের যে করুণ পরিণতি

ও দুরাবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আমরা বলব, বর্তমান দূরাবস্থা জাহিলিয়্যাতের যুগে যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিদায়েতের বাণী দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছিল, তখনকার দুরাবস্থা থেকে কোন ক্রমেই বেশি করুণ নয়। তখন মানবজাতির অবস্থা বর্তমান অবস্থার তুলনায় আরও অধিক খারাপ ও করুণ ছিল। বর্তমান সময়ে মানব জাতির জন্য ইতিবাচক দিক হল, এখন আমাদের সামনে রিসালাত ও পরিপূর্ণ দীন আছে। একটি অনুকরণযোগ্য হক জামাত আছে, যারা মানুষকে সহীহ ইসলাম ও আকীদার দিক আহ্বান করে এবং উত্তম আর্দশ ও মানবতার দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়। তবে এ কথা দিবা-লোকের মত স্পষ্ট, জাহিলিয়্যাতের যুগের আরবদের অবস্থা ও বর্তমান যুগের অনেক মুসলিম জামাতের অবস্থা অভিন্ন। বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা

যায়, বর্তমান যুগের মুসলিমদের অবস্থা জাহিলিয়্যাতের যুগের কাফেরদের অবস্থা হতে আরও বেশি করুণ।

এর উপর ভিত্তি করে আমরা বলব, বর্তমান যুগের মুসলিমদের চিকিৎসা এটাই যেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহিলিয়্যাতের যুগের লোকদের জন্য প্রয়োগ করে ছিলেন এবং তাদের ঔষুধও একই ঔষুধ। যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহিলিয়্যাতের যুগের লোকদের চিকিৎসা করেছেন, এ উম্মতের চিকিৎসা ও সংশোধন করতে হলে বর্তমানকালের ইসলাম প্রচারকদেরকেও একই চিকিৎসা প্রয়োগ করতে হবে। বর্তমান যুগের মানুষের মধ্যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থ সম্পর্কে যে ভ্রান্তি ও ভুল ব্যাখ্যা রয়েছে, তা দূর করার জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ ও চিকিৎসা চালাতে হবে। তাদের দূরাবস্থা ও করুণ পরিণতি দূর করতে হলে, রাসূল

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে চিকিৎসা ও ঔষধ গ্রহণ করেছেন, তার হুবহু অনুকরণ করতে হবে। আমরা যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর বাণী সম্পর্কে একটু চিন্তা করি, তখন আমরা আমাদের এ কথার অর্থ, আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ٢١﴾ [سورة الأحزاب:٢١].

“অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আর্দশ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে”। [সূরা আহযাব, আয়াত: ২১]

মোট কথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উত্তম আদর্শ। বর্তমানে মুসলিমদের সমস্যা সমাধান ও তাদের অধ:পতনের হাত হতে রক্ষা করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ অনুসরণ করার কোন বিকল্প নাই। কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর যত রকম সমস্যা হতে পারে, তার সমাধান রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেখে গেছেন। তিনিই আমাদের আদর্শ; তাকে আমাদের অনুকরণ করতে হবে। সুতরাং আমরা যখন উম্মতের সংশোধন করতে যাব, তখন তা দিয়েই শুরু করব, যা দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরু করেছিলেন। প্রথমে মুসলিম জাতির আকীদার চিকিৎসা করতে হবে। তাদের মধ্যে যে সব ভ্রান্ত আকীদা ও বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে আছে, তা প্রথমে দূর করতে হবে। তারপর তাদের ইবাদত বন্দেগীর ইসলাহ করতে হবে, তারপর তাদের মুয়ামালা বা লেন-দেন ইত্যাদির সংশোধন করতে হবে। এখানে যে ধারাবাহিকতার কথা আলোচনা করা হয়েছে, তার অর্থ এ নয়, প্রথমটি দ্বারা শুরু করবে তারপর যেটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটি, তারপর যেটি কম গুরুত্বপূর্ণ সেটি। এখানে সামগ্রিক

বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, মুসলিম দীন প্রচারকরা আকীদার বিষয়ে দাওয়াত দেয়াকে অধিক পরিমাণে গুরুত্ব দিবে। এখানে 'মুসলিম' দ্বারা সাধারণত উদ্দেশ্য হল, দীনের দায়ী তথা যারা দীনের দাওয়াত ও প্রসারের কাজ করে। তবে এ ক্ষেত্রে 'দায়ী বা দীন প্রচারক' না বলে 'ওলামা' শব্দ বলাই অধিক সঙ্গত। কারণ, অতি দু:খের সাথে বলতে হয়, বর্তমানে 'ইসলাম প্রচারক' বললে সব মুসলিম তথা যার মধ্যে সামান্যতম জ্ঞান, বুদ্ধি বা ইলম নাই তাকেও শামিল করা হয়; কারণ সবাই নিজেকে ইসলামের প্রচারক হিসেবে চালিয়ে দেয়। একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি হল – 'যার নিজের কাছে কিছু নাই, সে কাউকে কিছু দিতে পারে না' – এ মূলনীতি শুধু শরয়ী আলেম নয়, বরং সব জ্ঞানীদের নিকটও প্রসিদ্ধ। আমরা যদি তা নিয়ে আলোচনা করি, তখন আমরা বুঝতে পারব, বর্তমানে একটি বড় জামাত আছে, যখন আমরা 'দায়ী বা দীনের প্রচারক' শব্দ উচ্চারণ করি, তখন লক্ষ লক্ষ

মানুষের দৃষ্টি তাদের দিকে যায়, মানুষ মনে করে তারাই আল্লাহর পথের প্রচারক। এ বড় জামাত বলে আমি বুঝাচ্ছি, জামাতে তাবলীগ, বা তাবলীগ জামাত। অথচ তাদের অধিকাংশ লোকের অবস্থা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর বাণীর অনুরূপ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ١٨٧ ﴾ [سورة الأعراف: من الآية ١٨٧].

"অথচ অধিকাংশ মানুষ জানে না"। [সূরা আরাফ, আয়াত: ১৮৭]

তাদের দাওয়াতে পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা জানি তারা প্রথম যে বিষয়ে দাওয়াত দেয়া দরকার অর্থাৎ তাওহীদ তা হতে সম্পূর্ণ বিমুখ। তারপর যেটি গুরুত্বপূর্ণ অথাৎ ইবাদত এবং তারপর যেটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ মুয়ামালাত এ সবটির কোনটির কোন খবর নাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনকি সমগ্র নবী ও রাসূল যে বিষয়টি দ্বারা দাওয়াতের কাজ বা উম্মতের সংশোধন

আরম্ভ করেন, তা থেকে তারা একেবারেই বিমূখ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ﴾ [سورة النحل: من الآية 36].

“আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগুতকে”। [সূরা নাহাল, আয়াত: ৩৬]

তারা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ রুকন ও মৌলিক বিষয় হিসেবে মানুষের নিকট প্রসিদ্ধ সে সব গুরুত্বপূর্ণ রুকন ও মৌলিক বিষয়ের প্রতি তেমন কোন ভ্রূক্ষেপ করে না। অথচ সমস্ত রাসূলদের মধ্য হতে সর্বপ্রথম রাসূল নূহ আলাইহিস সালাম| তিনি প্রায় সাড়ে নয় শত বছর পর্যন্ত তার উম্মতদেরকে তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দেন| আমাদের কারও নিকট এ কথা

অজানা নয়, পূর্বের শরীয়তগুলো আমাদের শরীয়তের মত পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত ছিল না। আমাদের এ দ্বীন হল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ দ্বীন; যেখানে কোন অস্পষ্টতা নাই। এ দ্বীন হল, ইতিপূর্বে যত দীন দুনিয়াতে আর্ভিবাব হয়েছে, সব দ্বীন ও শরিয়তের সমাপ্তি। নূহ আ. তার কাওমের মধ্যে প্রায় সাড়ে নয় শত বছর অবস্থান করেন এবং তিনি এক মুহুর্তও আল্লাহর দ্বীন তথা তাওহীদের দাওয়াত হতে বিরত থাকেননি। রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা তিনি মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদের দিকে দাওয়াত দিতে থাকতেন। তারপরও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তার দাওয়াতে সাড়া দেয়া বা দাওয়াত কবুল করা হতে বিরত থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে এরশাদ করেন,

﴿وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّٗا وَلَا سُوَاعٗا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسۡرٗا ٢٣﴾ [سورة نوح: 23]

“আর তারা বলে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের বর্জন করো না; বর্জন করো না ওয়াদ, সুয়াদ, ইয়াগুছ ইয়াউক ও নাসরকে”। [সূরা নুহ, আয়াত: ২৩]

আল্লাহর বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইসলামের দায়ীদের জন্য প্রথম কাজ হল, প্রথমে তাওহীদের দাওয়াতের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া। এ কথাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে এরশাদ করে বলেন,

﴿ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [سورة محمد: من الآية 19].

“অতএব জেনে রাখ, নি:সন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই”। [সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ১৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শও হল, তিনি বাস্তবে মানুষকে প্রথমে তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেন, এবং

যাদের দাওয়াতের জন্য প্রেরণ করেন তাদেরকে প্রথমে তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়ার তালীম দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়া বিষয়ে প্রমাণ খোঁজার প্রয়োজন নাই। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কী জীবনে তার কাজ ও দাওয়াতই ছিল, একমাত্র এক আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়া ও তার সাথে ইবাদাতে কাউকে শরীক না করা। তিনি মক্কার কাফেরদের শুধু তাওহীদের দিকে দাওয়াত দিতেন। আর তিনি কাউকে দাওয়াতের তালীম দিতে প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার তালীম দিতেন। যেমন, বুখারি ও মুসলিমে আনাস বিন মালেক রা. এর হাদিস বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুয়াজ রা.কে ইয়ামনের দিকে প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাকে বলেন, তুমি তাদেরকে সর্ব প্রথম যে দাওয়াত দেবে তা যেন হয়, এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। যদি

তারা এ দাওয়াতে সাড়া দেয়...[1]। হাদিসটি প্রসিদ্ধ ও সবারই জানা।

« أن النبي صلى الله عليه و سلم عندما أرسل معاذًا إلى اليمن قال له: " ليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك لذلك»

মোট কথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিষয়টির দাওয়াত দিয়ে শুরু করেন, অনুরূপভাবে তার সাহাবীদেরকেও সে বিষয় দিয়ে দাওয়াত দেয়া শুরু করার নির্দেশ দেন। আর তা হল, তাওহীদের দাওয়াত। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে আরবের মুশরিক –যারা তাদের ভাষায় কি কথা বলা হত, তা তারা বুঝত- আর বর্তমান যুগের

[1] বুখারি কিতাবুয যাকাত, ১৩৩১, তিরমিযি যাকাত, ৬২৫, নাসায়ি যাকাত ২৪৩৫ আবু দাউদ যাকাত ১৫৮৪, ইবনে মাযা যাকাত ১৭৮৩।

অধিকাংশ মুসলিমদের মধ্যে বিশাল তফাত ও পার্থক্য আছে। বর্তমান যুগের মুসলিমদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার দাওয়াত দেয়ার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, বর্তমান যুগের মুসলিমরা তাদের বিশ্বাস, নিয়ম-নীতি ও মতামতের ভিন্নতা থাকা সত্বেও তারা মুখে 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ' বলে। তারা সবাই মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করে। কিন্তু তারা বাস্তবে কালিমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ ও মর্ম কি তা বুঝে না। বাস্তবে তাদের জন্য কালিমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ কি, তার মর্ম কি তা বুঝা অতীব জরুরি। বর্তমান যুগের মুসলিম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগের মুসলিমদের মধ্যে এটি একটি মৌলিক পার্থক্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগের মুশিরকদের যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার জন্য দাওয়াত দেয়া হত, তখন তারা তা বলতে অস্বীকার করত এবং প্রত্যাখ্যান করত। কুরআনে

বিষয়টিকে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয় এবং মুশরিকরা কি কারণে প্রত্যাখ্যান করত, তা জানানো হয়।[2]

কারণ, তারা এ কালিমার মর্মার্থ কি তা জানতো। এ কালিমার মর্মাথ হল, আল্লাহর সাথে কোন শরিক নির্ধারণ করো না, আর আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করো না। অথচ, তারা গাইরুল্লাহর ইবাদাত করে, গাইরুল্লাহকে ডাকে এবং গাইরুল্লাহর দ্বারা মানুষের থেকে সাহায্য কামনা করে। এ ছাড়াও তারা গাইরুল্লাহর জন্য মান্নত করত, গাইরুল্লাহকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করত, গাইরুল্লাহর নামে জবেহ করত, এবং গাইরুল্লাহর নিকট বিচার ফায়সালা নিয়ে যেত।

---

[2] সূরা সাফফাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ বাণীর প্রতি ইশারা করেন, যাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ} (الصافات:35 - 36).

তাদের পৌত্তলিকতা ও মুর্তি পুজাকে মাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করা ছিল খুব প্রসিদ্ধ। এতদসত্বেও তারা এ কথা ভালোভাবে জানত, আরবী ভাষা অনুযায়ী কালিমা তাইয়্যিবা- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র জন্য আবশ্যক হল, সব ধরনের গাইরুল্লাহ হতে দায়মুক্ত হওয়া এবং গাইরুল্লাহর ইবাদাত হতে বিরত থাকা। কারণ, কালিমা তাইয়্যিবার অর্থের সাথে গাইরুল্লাহর ইবাদাত করা, গাইরুল্লাহর নামে জবেহ করা এবং মুর্তি পুজা করা সবই সাংঘর্ষিক।

অধিকাংশ মুসলিম ভালো করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ কি তা জানে না।

অধিকাংশ মুসলিম যারা এ কথার সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তারা প্রকৃত পক্ষে এ কথার সত্যিকার অর্থ কি তা জানে না। বরং অনেক সময় দেখা যায়, তারা সম্পূর্ণ উল্টা ও

বিপরীত অর্থই জানে। এর একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করব, এক লোক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র অর্থ সম্পর্কে একটি রিসালা লিখেন। তাতে তিনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র ব্যাখ্যা করেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোন রব নাই'। এ অর্থটি এমন একটি অর্থ যার প্রতি মুশরিকরাও ঈমান আনত এবং তারা তা স্বীকার করত: কিন্তু তা সত্বেও তাদের এ ঈমান তাদের কোন উপকারে আসে নাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ﴾ [سورة لقمان: من الآية 25].

আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। [সূরা লোকমান, আয়াত: ২৫]

মুশরিকরা এ কথা বিশ্বাস করত যে, এ জগতের একজন স্রষ্টা আছে, যার কোন শরিক নাই, কিন্তু তারা আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্ত এবং ইবাদাতে তারা তার সাথে শিরক করত। তারা বিশ্বাস করত, রব এক কিন্তু তারা বিশ্বাস করত ইলাহ অসংখ্য। এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের এ বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং একে গাইরুল্লাহর ইবাদাত বলে আখ্যায়িত করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ﴾ [سورة الزمر: من الآية 3].

আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা কেবল এজন্য তাদের ইবাদাত করি যে, তারা

আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে। [সূরা যুমার, আয়াত: ৩]

মুশরিকরা এ কথা ভালো করেই জানত, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার অর্থ হল, আল্লাহ ছাড়া যত ইলাহের ইবাদাত করা হয় তা হতে দায়মুক্তি ঘোষণা করা। কিন্তু বর্তমান যুগের অধিকাংশ মুসলিম কালিমায়ে তাইয়্যেবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ কি তা জানে না। ফলে তারা কালিমাকে স্বীকার করে এবং সাথে গাইরুল্লাহর দাসত্বও করে। আবার অনেকেই কালিমার ব্যাখ্যা করে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রতিপালক নাই। এ অর্থ সম্পূর্ণ ভুল। যখন কোন মুসলিম কালিমা তাইয়্যেবা لا إله إلا الله বলে এবং সে আল্লাহর সাথে গাইরুল্লাহর ইবাদাত করে, তাহলে তার মধ্যে ও একজন মুশরিকের মধ্যে বিশ্বাসগত দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নাই। বাহ্যিক দিক দিয়ে সে যদিও একজন মুসলিম, কারণ, সে

কালিমা لا إله إلا الله উচ্চারণ করে, কিন্তু বাস্তবে সে মুসলিম নয়। এ ধরনের লোক যারা কালিমার অর্থ জানে না, আমাদের ইসলাম প্রচারক ভাইদের কর্তব্য হল তাদেরকে প্রথমে তাওহীদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়া এবং কালিমার অর্থ কি তার উপর দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করা। তবে মুশরিকদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, তারা কালিমা لا إله إلا الله বলাকেই অস্বীকার করে। ফলে তারা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন উভয় দিক বিবেচনায় তারা মুশরিক, তারা কোন বিবেচনায় মুসলিম হতে পারে না। তবে বর্তমানে মুসলিম জনগোষ্ঠিকে মুসলিম ছাড়া অন্য কিছু বলা যাবে না। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى »

আর যখন তারা এ কালিমা মুখে বলে, তখন তাদের জান ও মাল আমাদের নিকট নিরাপদ। তবে এ কালিমার অধিকার তার উপর বর্তালে ভিন্ন কথা, আর তাদের হিসাব আল্লাহর নিকট[34]।

এ কারণেই আমি একটি কথা বলব - যা আমার থেকে খুব কমই শোনা যায়। তা হল, বর্তমান যুগের অধিকাংশ মুসলমানদের অবস্থা জাহিলিয়্যাতের যুগের মুসলিমদের অবস্থার তুলনায় অনেক খারাপ। বর্তমান যুগের অধিকাংশ মুসলিম এ কালিমার বিশুদ্ধ অর্থ সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না। পক্ষান্তরে তৎকালীন যুগের আরবরা কালিমার অর্থ কি তা জানত ও বুঝত, কিন্তু তারা তাতে বিশ্বাস করত না। আর বর্তমান যুগের মুসলিমরা যা বিশ্বাস করে

---

[3] বুখারি কিতাবুল জিহাদ, ২৭৮৬, মুসলিম কিতাবুল ঈমান ২১, তিরমিযি কিতাবুল ঈমান, ২৬০৬, নাসায়ী তাহরীমুত দম।

[4] হাদিসটি বিশুদ্ধ বুখারি হাদিসটি বর্ণনা করেন, মুসলিম, ২২

না, তা বলতে তারা কোন প্রকার দ্বিধা করে না। তারা لا إله إلا الله বলে, কিন্ত তারা প্রকৃত অর্থের উপর ঈমান আনে না[5]।

এ কারণেই আমি মনে করি সত্যিকার মুসলিম দীন প্রচারকদের প্রথম কর্তব্য হল, তারা মানুষকে এ কালিমার দাওয়াত দিবে এবং এ কালিমার মর্মার্থ কি তা তুলে ধরবে। তারপর এ কালিমার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে এবং যাবতীয় ইবাদাত বন্দেগীতে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের অনুসরণ বিষয়ে দাওয়াত দিবে। কারণ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুশরিকদের আলোচনা করতে গিয়ে তাদের অবস্থার বর্ণনা তুলে ধরেন,

﴿مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ﴾ [سورة الزمر: من الآية 3]

[5] তারা কবরের ইবাদাত করে, গাইরুল্লাহর জন্য জবেহ করে, মৃতদের ডাকে।

'আমরা কেবল এ জন্যই ইবাদাত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে। [সূরা যুমার, আয়াত: ৩]

আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সব ইবাদাত গাইরুল্লাহর জন্য করা হয়, তাকে কালিমায়ে তাইয়্যেবার সাথে কুফরী বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ কারণেই আমি বলি, বর্তমানে কালিমা তাইয়্যেবার সঠিক অর্থ সম্পর্কে মুসলিমদের না দাওয়াত দিয়ে, গোমরাহিতে রেখে মুসলিমদের একত্র করা ও তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি কর্মে কোন ফায়েদা নাই। এ দ্বারা একজন মুসলিম দুনিয়াতেও লাভবান হতে পারবে না এবং আখেরাতেও না। আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী সম্পর্কে অবশ্যই জানি, তিনি বলেন,

« من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه حرم الله بدنه على النار» وفي رواية أخرى: « دخل الجنة »

“যে ব্যক্তি মারা যায় এবং সে তার অন্তর থেকে খালেস ভাবে এ কথার সাক্ষী দেয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার দেহকে জাহান্নামের উপর হারাম করে দেয়[6]। অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে”[7], [8]।

সুতরাং, যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে এ কালিমা বলবে, তার জন্য অবশ্যই জান্নাতের জিম্মদারি গ্রহণ করা যাবে, যদিও তার জান্নাতে প্রবেশ করা, আযাব বা শাস্তি ভোগ করার পর হবে। যদি কোন ব্যক্তি এ কালিমার সঠিক অর্থকে বিশ্বাস করে এবং সে কোন অপরাধ করে থাকে, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে

---

[6] আহমদ: ১২/৩

[7] বুখারি কিতাবুল লিবাস: ৫৪৮৯

[8] হাদিসটি বিশুদ্ধ, বর্ণনা করেছেন ইবনে হিব্বান, আহমাদ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

তার গুণাহ ও অন্যায়ের কারণে শাস্তি দেবে, কিন্তু আযাব ভোগ করার পর তার গন্তব্য হবে জান্নাত। আর যে ব্যক্তি কালিমার মর্মার্থকে বিশ্বাস করে না, তার গন্তব্য হবে জাহান্নাম। কোন ব্যক্তি শুধু মুখে এ কালিমা উচ্চারণ করল, কিন্তু তার অন্তরে ঈমান নাই, তাহলে তার জন্য এ কালিমা দুনিয়াতে কিছু সমস্যা হতে তাকে মুক্তি দিলেও আখেরাতে সে মুক্তি পাবে না। অর্থাৎ, যখন দুনিয়াতে মুসলিমদের ক্ষমতা থাকবে, তখন তাকে হত্যা করা হবে না, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে না। কিন্তু আখেরাতে এ কালিমার উচ্চারণ করা তার কোন উপকারে আসবে না। হ্যাঁ, যদি সে এ কালিমার অর্থ বুঝে, তারপর এ কালিমার অর্থের উপর বিশ্বাস রাখে, তখন এ কালিমা [আখেরাতে] তার উপকারে আসবে। কারণ, শুধু কালিমার অর্থ বুঝা নাজাত পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, তবে এ কালিমার অর্থের সাথে ঈমান ও বিশ্বাস থাকতে হবে। তখনই এ কালিমা মানুষের কাজে লাগবে এবং উপকারে আসবে।

আমার ধারণা মতে অধিকাংশ মানুষ এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞ। অর্থাৎ, শুধু কালিমার অর্থ বুঝার নাম ঈমান নয়, বরং মুমিন হওয়ার জন্য কালিমার অর্থের সাথে সাথে মুখে স্বীকার করাও একত্র হতে হবে। যখন দুটি জিনিস একত্র হবে, তখনই ঈমানদার হবে। কারণ, আহলে কিতাব যারা তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়ত ও রিসালাতের যে দাওয়াত নিয়ে এসেছে, তা সম্পর্কে তার ভালো ভাবেই জানে। কিন্তু তাদের এ জানা তাদের কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَعۡرِفُونَهُۥ كَمَا يَعۡرِفُونَ أَبۡنَآءَهُمۡۖ﴾ [سورة البقرة: من الآية 146]

যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছে, তারা তাকে চিনে যেমন চিনে তাদের সন্তানদেরকে। [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ১৪৬]

কেন উপকারে আসবে না? কারণ, তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়ত ও রিসালাতের যে দাওয়াত দিচ্ছে, তা অস্বীকার এবং প্রত্যাখ্যান করছে। সুতরাং, ঈমানের পূর্বে শুধু আল্লাহর সম্পর্কে জ্ঞান থাকা কোন উপকারে আসবে না। বরং, এ জ্ঞানের সাথে ঈমান ও বিশ্বাস দুটি জিনিস জরুরি। কারণ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে এরশাদ করে বলেন,

﴿ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ ﴾ [سورة محمد: من الآية 19].

"অতএব জেনে রাখ, নি:সন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই, তুমি তোমার গুণাহের জন্য ক্ষমা চাও"। [সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ১৯]

এর উপর ভিত্তি করে, আমরা বলব, যখন কোন মুসলিম মুখে لا إله إلا الله বলে তাকে অবশ্যই এ কালিমার সার সংক্ষেপ

সম্পর্কে অবগত হতে হবে, তারপর এর বিস্তারিত বিষয় সম্পর্কে জানতে হতে হবে। যখন কোন মানুষ কালিমার বিষয় বস্তু সম্পর্কে অবগত হল, তারপর সে তা বিশ্বাস করল এবং তার উপর ঈমান আনল, তা হলে তার বিষয়ে পূর্বে উল্লিখিত হাদিসগুলো প্রযোজ্য হবে। সে হাদিসের ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ ছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কালিমার বিস্তারিত অর্থের প্রতি ইংঙ্গিত করে বলেন,

« من قال: لا إله إلا الله، نفعته يومًا من دهره »

অর্থ: যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, এ কালিমা তার জীবনের কোন না কোন একটি সময় তার উপকার করবে[9]। অর্থাৎ, এ কালিমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ জানা ও তার উপর বিশ্বাস করার ফলে কালিমা অবশ্যই তাকে চির জাহান্নামী হওয়া থেকে

[9] হাদিসটি বিশুদ্ধ আল্লামা আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

নাজাত দেবে। যদিও কালিমার চাহিদা অনুযায়ী নেক আমলসমূহ সে করতে পারে নাই এবং গুণাহসমূহ হতে বিরত থাকতে পারে নাই। কিন্তু সে শিরকে আকবর থেকে মুক্ত থাকছে, কালিমার চাহিদা অনুযায়ী অন্তরের আমল ঠিক ছিল এবং আহলে ইলমদের ইজতিহাদ মোতাবেক ঈমানের জন্য নির্ধারিত শর্তসমূহের যাবতীয় শর্তসমূহ সে পালন করছে। এ মাসআলাটিতে আরও অনেক তাফসীল ও ব্যাখ্যা আছে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ নাই।[10]

এ লোকটি আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করতে হবে, সে যে সব অপরাধ ও অন্যায় করছে এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করছে তার বিনিময়ে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। জাহান্নামে

---

[10] এ হল, সালফে সালেহীনের আকীদা। আর এটিই আমাদের মাঝে ও খারেজি ও মুরজিয়াদের প্রার্থক্যের মানদণ্ড।

অবস্থান করার পর এ কালিমায়ে তাইয়্যেবা তাকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দেবে অথবা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার অনুগ্রহ দ্বারা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। পূর্বে উল্লেখিত রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীর অর্থ এটাই। من قال: لا إله إلا الله، نفعته يومًا من دهره، যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, এ কালিমা তার জীবনের কোন না কোন একটি সময় তার উপকার করবে।

আর যারা এ কালিমা মুখে বলে, কিন্তু তার অর্থ কি তা জানে না, অথবা তার অর্থ কি তা জানে, তবে তার অর্থের প্রতি বিশ্বাস করে না, তারা লা ইলাহা ইল্লাহ বলা দ্বারা আখেরাতে কোন উপকার লাভ করতে পারবে না। তবে দুনিয়াতে যদি সে ইসলামী শাসনের আওতায় বসবাস করে, তখন সে উপকৃত হতে পারবে। এ কারণেই আমরা বলি, প্রতিটি সমাজে মানুষকে তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়ার উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

অনুরূপভাবে যারা ইসলামী আন্দলোনের নামে কাজ করে সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্র বা সমাজ গঠন করতে চায় এবং যেখানে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা হয় না সেখানে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করতে চায়, তাদের সবাইকে প্রথমে তাওহীদের উপর দাওয়াত দেয়ার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যথায় তারা আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করার অভিষ্ট লক্ষে পৌছতে পারবে না। তাদেরকে অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতদেরকে মুক্তি দেয়ার জন্য যে দাওয়াত শুরু করেছিল, সে দাওয়াত দিয়েই শুরু করতে হবে।

আক্বীদার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়ার অর্থ শরীয়তের অন্যন্য আমল ইবাদাত আখলাক ও মুয়ামালাত ছেড়ে দেয়া নয়।

আমি একটি বিষয় আবারও সতর্ক করছি, আকীদা বা কালিমায়ে তাইয়্যেবার সঠিক অর্থ বুঝানোর প্রতি দাওয়াত দেয়ার

কথা বলা দ্বারা প্রথমে আকীদা যা অধিক গুরুত্বপূর্ণ, তারপর যা কম গুরুত্বপূর্ণ তার দাওয়াত দিতে হবে, এমন কোন কথা আমি বলছি না। কারণ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন এবং তার নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করেছেন; এখানে কোনটিকে বাদ দিয়ে দাওয়াত দেয়া বা দাওয়াতের কাজ করার সুযোগ নাই। বরং আল্লাহর দেয়া দ্বীনের পরিপূর্ণ আনুগত্য করতে হবে এবং পরিপূর্ণ দ্বীনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে। আমি যখন এ বয়ান করি, যার সারাংশ হল, ইসলামের সত্যিকার প্রচারকরা এমন বিষয়টিকে গুরুত্ব দেবে, যাকে ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে এবং যা নিয়ে দুনিয়াতে ইসলামের আগমন ঘটেছে, আর তা হল কালিমায়ে তাইয়্যেবা থেকে নির্গত অর্থ- আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার ইলাহ নাই- বা বিশুদ্ধ আকীদা, তখন আমি আমার বয়ানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলি, আমার কথা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য এ নয় যে, একজন মুসলিম শুধু কালিমার অর্থ- আল্লাহ

ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নাই- তা জানবে, বরং তাকে কালিমার অর্থ জানার সাথে সাথে এ কথাও জানতে হবে, যে সব ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে থাকে, সে সব ইবাদাতের কোন অংশকে গাইরুল্লাহ বা আল্লাহর কোন মাখলুকের জন্য সোপর্দ করা যাবে না এবং এমন কোন ইবাদাতে আল্লাহর সাথে আল্লাহর বান্দাদের থেকে কোন বান্দাকে শরিক করা যাবে না। এ ব্যাখ্যাটি অবশ্যই কালিমায়ে তাইয়্যেবার সংক্ষিপ্ত অর্থের সাথে একত্র করতে হবে। এখানে সুন্দর হয়, কথাটি বুঝানোর জন্য একটি দৃষ্টান্ত বা একাধিক দৃষ্টান্ত যা আমার জন্য সম্ভব হয়- বর্ণনা করা, যাতে বিষয়টি বুঝতে সহজ হয়। কারণ, সংক্ষিপ্ত আলোচনা বিষয়টি বুঝার জন্য যথেষ্ট নয়।

আমি বলি, অধিকাংশ মুসলিম যারা সত্যি সত্যি একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং তারা তাদের ইবাদাতসমূহ একমাত্র আল্লাহর জন্য

করে, গাইরুল্লাহর জন্য করে না, তাদের অন্তর সমূহ কুরআন ও সুন্নাহে যে সব সঠিক আক্বীদা ও বিশুদ্ধ চিন্তা-চেতনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হতে শূণ্য। তাওহীদে বিশ্বাসী ও সঠিক আকীদার ধারক-বাহক অনেককে দেখা যায়, তারা যখন বিশুদ্ধ আকীদা সম্বলিত কুরআনের আয়াত বা হাদীসের বাণীসমূহ তাদের সামনে আসে, তখন তারা আয়াত ও হাদীসের মর্মার্থ সম্পর্কে সতর্ক হয় না এবং বুঝতে সক্ষম হয় না। অথচ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়ার জন্য এসব আয়াতসমূহ ও হাদীসের বাণীসমূহ বুঝার কোন বিকল্প নাই। 'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সৃষ্ট মাখলুকাতের উপর আছেন' এ বিষয়ে আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে একটি দৃষ্টান্ত বলছি, তাতে তোমরা চিন্তা করে দেখ! তাওহীদে বিশ্বাসী অধিকাংশ সালাফী ভাইরা এ কথা বিশ্বাস করে কোন প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও পদ্ধতি নির্ধারণ ছাড়া যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরশের উপর আছেন। কিন্তু যখন তারা

কোন মুতাযিলা, জাহমিয়্যাহ, মাতুরিদি বা আশয়ারীদের মুখোমুখি হয় এবং তারা আয়াতের বাহ্যিক অর্থের উপর এমন কোন প্রশ্ন উত্থাপন বা যুক্তি তুলে ধরে, যার অর্থ তারাও বুঝে না এবং যাদের নিকট উত্থাপন করল, তারাও বুঝেনা, তখন তারা তাদের বিশ্বাস ও আকীদা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং দ্বিধা-দন্দ্বে পড়ে। এর কারণ কি? এর কারণ, মুলত: তারা সহীহ আকীদাকে আমাদের রবের কিতাব ও আমাদের নবীর সুন্নাত হতে সার্বিক দিক বিবেচনা করে শিখে নাই। যখন একজন মুতাজেলা বলে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿ ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ﴾ [سورة الملك: الآيتان 16-17].

“যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের সহ যমীন ধসিয়ে দেয়া থেকে কি তোমরা নিরাপদ হয়ে গেছ”। [সূরা মুলুক, আয়াত: ১৬,১৭]

আর তোমরা বল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আসমানে। এর অর্থ হল, তোমরা তোমাদের মাবুদকে আল্লাহর মাখলুক আসমান নামক পাত্রে রাখছ। কারণ, সে তার সামনে যাদের পায় তাদেরকে একটি সন্দেহ সংশয়ে ফেলে দেয়।

অনেক ঈমানদারের নিকট সহীহ আকীদা ও তার জরুরি বিষয়গুলো অস্পষ্ট থাকার বর্ণনা : এ দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হল, দু:খ প্রকাশ করা এবং এ কথা বর্ণনা করা যে, অধিকাংশ লোক যারা সালফী আক্বীদায় বিশ্বাসী তারা নিজেরা বিশুদ্ধ আকীদা, আকীদার জরুরি বিষয় ও তার আনুসাঙ্গিক বিষয়গুলো কি তা জানে না। তাহলে যারা ভিন্ন আকীদার পোষণ করে বা

যারা আশয়ারী, মাতুরিদি ও জাহমীয়া তারা যদি সহীহ আক্বীদা কি তা না জানে তাদের সম্পর্কে কি বলার আছে?। মোট কথা, আমি বলব, আমাদের সাথে যারা মানুষকে কিতাব ও সুন্নাতের দিকে দাওয়াত দেয়, তাদের জন্য বিষয়টি তারা যেমন সহজ মনে করেন তেমনটি সহজ নয়। বরং বিষয়টি কঠিন আছে। এর কারণ আমরা আগেই উল্লেখ করছি, বর্তমান যুগের জাহিলিয়্যাত এবং পূর্ব যুগের জালিয়্যাতের মধ্যে পার্থক্য আছে। জাহিলিয়্যাতের যুগের কাফেরদের যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার জন্য দাওয়াত দেয়া হত, তখন তারা তা বলতে অস্বীকার করত। আর বর্তমান অধিকাংশ মুসলিম তারা এ কালিমা মুখে বলে, কিন্তু এর সঠিক অর্থ কি তা জানে না। এ মৌলিক পার্থক্যটি সর্ব ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত, এমনকি এ সব আকীদা-আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সমগ্র মাখলুকাতের উপর হওয়া- বিষয়েও তা পরিলক্ষিত। তবে এখানে একটি ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ, একজন

মুসলিমের জন্য এ কথা বিশ্বাস করা ঠিক হবে না যে, আল্লাহ আসমানে স্থান গ্রহণ করেছেন। তাকে অবশ্যই এ কথা জানতে হবে, হাদীসের মধ্যে উল্লেখিত ফী শব্দটি এখানে স্থানের জন্য নয়। ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء তোমরা জমিনে যারা আছে তাদের প্রতি দয়া কর, তাহলে যিনি আসমানে আছে, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন[11]। এখানে হাদীসটিতে ফী শব্দটির অর্থ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর বাণী- ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ [طه:5]. তে 'আলা শব্দেরও ঠিক একই অর্থ। অর্থাৎ, ফী শব্দের অর্থ এখানে 'আলা। এর আরেকটি দৃষ্টান্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর বাণী- ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ [سورة الملك: الآيتان ১৫-16] [যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের সহ

[11] তিরমিযি কিতাবুল বির ওয়াস সিলা ১৯২৪, আবু দাউদ কিতাবুল আদব: ৪৯৪১

যমীন ধসিয়ে দেয়া থেকে কি তোমরা নিরাপদ হয়ে গেছ,] এখানে ফী শব্দটির অর্থ 'আলা।

এর উপর অসংখ্য দলীল রয়েছে। এর একটি দলীল হল, মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ উল্লেখিত হাদিস। আল্লাহর শুকর, হাদিসটি সব সনদেই বিশুদ্ধ। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী ارحموا من في الأرض এর অর্থ শুধু যে সব কিট প্রতঙ্গ জমিনের অভ্যন্তরে আছে, তা নয়, বরং যে সব জীব-জন্তু, মানুষ ও হাইওয়ান জানোয়ার জমিনের উপরে আছে, সেগুলোকেও বোঝানো হয়েছে। অনুরুপভাবে يرحمكم من في السماء এর অর্থও একই। এখানে ফী শব্দের অর্থ উপর। আর মনে রাখতে হবে, এ ধরনের ব্যাখ্যা ও জ্ঞান যারা হকের দাওয়াত দিতে পছন্দ করে, তাদের জন্য আবশ্যক। তারা অবশ্যই দলীল প্রমাণের উপর অঢেল জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে, যাতে কোন প্রকার প্রশ্ন বা

যুক্তি তাদেরকে তাদের বিশ্বাস থেকে চুল পরিমাণও সরাতে না পারে। এ ধরনেরই একটি হাদীস হল, একজন মহিলা যে ছাগল চরাতো। হাদীসটি সবার নিকট প্রসিদ্ধ। আমি এ হাদীস থেকে যে বিষয়টি উল্লেখ করব, সেটি হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহ কোথায়? উত্তরে মহিলাটি বলল, আল্লাহ আসমানে। এখন যদি তুমি জামেয়া আজহারের বড় শেখকে জিজ্ঞাসা কর, আল্লাহ কোথায়? তখন সে উত্তরে তোমাকে বলবে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। অথচ, উক্ত মহিলা উত্তর দিল, আল্লাহ আসমানে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উত্তরকে গ্রহণ করলেন। কারণ! মহিলাটি ফিতরাতের ভিত্তিতে উত্তর দেন। আর বর্তমান সময়ের সাথে মিলিয়ে বলল, আমাদের পরিভাষায় বললে বলতে হয়, সে সালাফী পরিবেশে বসবাস করত, কোন খারাপ পরিবেশ তাকে স্পর্শ করেনি। কারণ সে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

মাদরাসা হতে ডিগ্রি লাভ করেছে, যে মাদরাসা কোন বিশেষ কতক পুরুষ বা নারীর জন্য খাস ছিল না। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাদরাসা সব মানুষের জন্য উম্মুক্ত ছিল। এখানে নারী, পুরুষ ও সমাজের সব মানুষ শিক্ষা লাভ করতে পারত। এ কারণেই একজন ছাগলের পাহারাদার মহিলা বিশুদ্ধ আকীদা কি তা জানত। কারণ, সে কোন খারাপ পরিবেশের সাথে মিশেনি, ফলে সে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সহীহ আকীদা জানত, অথচ বর্তমানে যারা কুরআন ও হাদীসের বড় বড় আলেম বলে দাবী করে, তাদের অধিকাংশ লোক এ কথা জানে না যে, তাদের রব কোথায়? অথচ কুরআন ও হাদীসে বিষয়টি স্পষ্ট করা আছে। আজ আমি বলব, মুসলিমদের জন্য এর চেয়ে স্পষ্ট আর কোন কিছুই পাওয়া যাবে না যে, যখন কোন একজন উম্মতের কর্ণধার বা উম্মতের পথ প্রদর্শককে জিজ্ঞাসা কর, আল্লাহ কোথায়? তখন সে এ কথার জবাব দিতে গিয়ে,

হতভম্ব হয়ে যাবে, যেমনটি হতভম্ব হবে বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম। একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাদের অনুগ্রহ করেছেন তদের ছাড়া।

সহীহ আকীদার প্রতি দাওয়াত দেয়ার জন্য প্রয়োজন অবিরাম সংগ্রাম ও আপ্রাণ চেষ্টা

একটি কথা মনে রাখতে হবে, তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দেয়া এবং বিশুদ্ধ আকীদাকে মানুষের অন্তরে গেঁথে দেয়ার জন্য প্রয়োজন হল, প্রথমত: রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে সাহাবীদের মত কুরআনের আয়াতসমূহের বাহ্যিক অর্থকে গুরুত্ব দেয়া। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে সাহাবীরা আরবী ভাষা সহজেই বুঝতে পারত। ফলে তাদের জন্য কুরআন থেকে বিশুদ্ধ আকীদা জানা ও শেখা সহজ ছিল। দ্বিতীয়ত: তাদের যুগে মানতেক, হিকমত, ফালসাফা ও ইলমে

কালাম ইত্যাদি না থাকার কারণে, আকীদা বিষয়ে কোন প্রকার বক্রতা বা বিকৃতি ছিল না এবং আকীদার পরিপন্থি কোন বিষয় নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে তর্ক-বিতর্ক ছিল না। কিন্তু বর্তমানে আমাদের পরিবেশ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগের মুসলমানদের পরিবেশের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং, এ কথা ধারনা করা যাবে না যে, বর্তমানে মানুষকে বিশুদ্ধ আকীদার প্রতি দাওয়াত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগের মত সহজ। এ বিষয়ে কাছকাছি দুটি দৃষ্টান্ত পেশ করব, যাতে কেউ দ্বি-মত পোষণ করবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে সাহাবীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি হাদিস শুনতো, তারপর তাবেয়ীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের থেকে সরাসরি হাদিস শুনতো, এভাবে তিনটি যুগ অতিবাহিত হয়, যাদের যুগকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়াসাল্লাম উত্তম যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এখন আমি প্রশ্ন করব, তখন কি এমন কোন ইলম ছিল, যাকে ইলমে হাদীস বলা হত? উত্তরে অবশ্যই বলতে হবে, না। এখানে এমন কোন ইলম ছিল, যাকে ইলমে জারহ বা তাদিল বলা হত? উত্তরে বলতে হবে, না। কিন্তু বর্তমানে তালেবে ইলমদের জন্য এ দুটি ইলম অবশ্যই জানা থাকতে হবে। এ দুটি ইলম শিক্ষা করা ফরজে কিফায়া। এ দুটি ইলম জানা দ্বারা একজন আলেম জানতে পারবে হাদীসটি সহীহ নাকি দূর্বল বা হাদীসটির উপর আমল করা যাবে, নাকি যাবে না। সুতরাং বর্তমানে বিষয়টি এত সহজ নয়, যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে সহজ ছিল। কারণ, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখ থেকে সরাসরি হাদীস শুনতে পেত, তাদের জন্য জারাহ ও তাদীলের ইলম শিখার প্রয়োজন হত না। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে বিষয় যেভাবে সহজ ছিল, বর্তমানে বিষয়টি

তেমনটি সহজ নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে ইলম ছিল খালেস, তার মধ্যে কোন প্রকার অবকাশ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে আমরা যারা মুসলিম, তারা বিভিন্ন সমস্যার বেড়া জালে আবর্তিত। তাই আমরা যখন মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি দাওয়াত দিয়ে থাকি, তখন আমাদেরকে অবশ্যই বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। আমাদের এ সব সমস্যার কারণে আমাদের আকীদার বিষয়গুলো বিদআতি ও আহলে কালামীদের পক্ষ হতে নানাবিদ প্রশ্নের সম্মুখীন।

এ বিষয়ে বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত কিছু বিষয় আলোচনা করা ভালো মনে করি। যেমন- রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঐ সব হাদীসগুলো উল্লেখ করেন, তাদের কারো কারো পঞ্চাশ গুণ সাওয়াব দেয়া হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«للاحد منهم خمسون من الأجر "، قالوا: منا يا رسول الله أو منهم ؟ قال: "

منكم. »

“তাদের মধ্য হতে কোন একজনকে পঞ্চাশ গুণ বেশি সাওয়াব দেয়া হবে”। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের থেকে নাকি তাদের থেকে? রাসূল বলল, তাদের থেকে[12]।

বর্তমানে ইসলামের যে পরিণতি, এই পরিণতি ইসলামের প্রথম যুগে ছিল না। কারণ, ইসলামের প্রথম যুগের সংঘর্ষ ছিল, স্পষ্ট শিরক ও নীরেট তাওহীদের মাঝে এবং প্রকাশ্য কুফর আর প্রকৃত ঈমানের মাঝে। বর্তমানে মুসলিমদের নিজেদের সমস্যাই প্রকট।

---

[12] আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ হতে হাদিসটি তাবরানী বর্ণনা করেন। হাদীসটি বিশুদ্ধ। আল্লামা আলবানী রহ. হাদিসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন। আবু দাউদ ৩৪৪১

অধিকাংশ মুসলিমের তাওহীদ শিরক মিশ্রিত। তারা তাদের ইবাদাত বন্দেগীকে গাইরুল্লাহর জন্য নিবেদিত করে কিন্তু মুখে ঈমানের দাবি করে। প্রথমত এ বিষয়টি জানা আমাদের জন্য খুবই জরুরি। তারপর দ্বিতীয়ত আমাদেরকে জানতে হবে, আমাদের এ কথা বলা উচিত হবে না, আমাদের তাওহীদের ধাপকে বাদ দিয়ে ভিন্ন ধাপে এগিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ, রাজনৈতিক কর্ম-কাণ্ড চালিয়ে যাওয়া। কারণ, ইসলামের দাওয়াত দেয়াই হল, সত্য দাওয়াত। সুতরাং, আমাদের এ কথা বলা ঠিক হবে না, আমরা আরব । কুরআন আমাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। কারণ, আমাদের মনে রাখতে হবে, অনারব যারা আরবী ভাষা শিখেছে, তারা আরবদের তুলনায় কুরআন হাদীস জানা ও বুঝা সম্পর্কে অধিক অগ্রসর। কারণ, আরবরা তাদের নিজেদের ভাষা জানা ও বুঝা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। ফলে তারা

তাদের রবের কিতাব ও তাদের নবীর সুন্নাত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন হতে অনেক দূরে সরে আছে।

আমরা আরবরা সহীহ ইসলাম কি তা শিখেছি। সুতরাং আমাদের জন্য উচিত হবে না এমনভাবে রাজনৈতিক কর্ম-কাণ্ডে জড়িত হওয়া এবং মানুষকে রাজনৈতিক কাজে জড়িত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা যাতে মানুষের জন্য যে কাজ করা জুরুরি যেমন ইসলাম সম্পর্কে জানা, সঠিক আকীদা সম্পর্কে জানা, মুয়ামালা সম্পর্কে জানা ইত্যাদি তা হতে মানুষকে বিরত রাখা হয়। আমরা এ কথা বিশ্বাস করি না যে, আমাদের দেশে সব জনগণ, সঠিক ইসলাম অর্থাৎ বিশুদ্ধ আকীদা, ইবাদাত ও আখলাক সম্পর্কে জানে এবং তারা তার উপর অভ্যস্থ।

পরিবর্তনের মূল হল, সংস্কার ও তারবীয়তের প্রদ্ধতি অবলম্বন করা

এ কারণেই আমরা সব সময় - হক প্রতিষ্টার জন্য- দুটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি আহ্বান করি এবং অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আর তা হল, সংস্কার ও তারবীয়ত। সংস্কার ও আন্দোলন দুটি এক সাথে হওয়া জরুরি। যদি কোন দেশে আকীদার বিষয়ে সংস্কার পাওয়া যায়, তাহলে তাকে অবশ্যই বড় ও মহান কাজ ধরা হবে যে, ইসলামী সমাজের একটি অংশে বা কতক মুসলিম জন গোষ্টির মধ্যে আকীদার সংশোধন ও সমাজ সংস্কারের মত একটি কাজ চলছে। আর ইবাদাতের ক্ষেত্রে বলতে হয়, ইবাদাতকে মাযহাবীয়ত ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে রাখতে হবে এবং বিশুদ্ধ হাদীস নির্ভর করতে করতে হবে। বর্তমানে মুষ্টিময় কতক ওলামায়ে কেরাম আছে, যারা ইসলামকে পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধভাবে

বুঝতে পারেন। কিন্তু আমি মনে করি, একজন, দুই জন, তিন জন বা দশজন মুষ্টিময় লোকের বিশুদ্ধ বা পরিপূর্ণ ইসলাম বোঝার দ্বারা ইসলামের মধ্যে আকীদা বিশ্বাস, ইবাদাত বন্দেগী বা আখলাকের ক্ষেত্রে যে ময়লা আবর্জনা প্রবেশ করছে, তা পরিস্কার বা সংস্কার করার দায়িত্ব আদায় করা সম্ভব নয়। ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করা কু-সংস্কারের সংস্কার ও ইসলামী সমাজে বসবাসকারী অসংখ্য জন গোষ্টিকে বিশুদ্ধ আকীদার উপর উঠানো ও তাদের সঠিক পথে পরিচালনার মত মহান দায়িত্ব আদায় করার জন্য স্বল্প সংখ্যক লোকের প্রচেষ্টা ও ত্যাগ যথেষ্ট নয়। তাদের দ্বারা এত বড় দায়িত্ব আদায় করা সম্ভব নয়। মোট কথা, সংশোধন ও তারবীয়ত বর্তমানে একে বারে শূন্যের ঘরে অবস্থান করছে।

যে কোন মুসলিম সমাজ যেখানে ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী সমাজ পরিচালিত হয় না, উল্লেখিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের

বাস্তবায়ন ছাড়া রাজনৈতিক আন্দোলন করার পরিণতি কখনো শুভ হবে না। বরং এর খারাব প্রভাব মানুষকে পিছিয়ে দেয়। তবে পরামর্শের মাধ্যমে অথবা শরীয়ত সম্মত বিধি বিধানের আলোকে উত্তম পদ্ধতিতে নছিহত করা, কোন প্রকার বাধ্য করা বা মিটিং মিছিল করা ছাড়া রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। মানুষের নিকট দাওয়াত পৌছে দিলে তাদের বিপক্ষে হুজ্জত কায়েম করা, দায়িত্ব ও জিম্মাদারি আদায় হতে মুক্তি পাওয়া যাবে। আরও উপদেশ হল, মানুষকে এমন সব কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে, যা তাদের উপকারে আসে। তাদের আকীদা শুদ্ধ করতে হবে, ইবাদাত বন্দেগী, আখলাক ও মুয়ামালাত ঠিক করতে হবে। অনেকে বলে আমরা মুসলিম সমাজে বিশুদ্ধ আকীদা ও তালীম তারবীয়ত বাস্তবায়ন করতে চাই! তবে এটি এমন একটি বিষয় যে কাজটি দ্বারা আকীদার বাস্তবায়ন বিষয়ে আমরা কোন চিন্তাও করি না এবং স্বপ্নও দেখি

না। কারণ, এ সবের মাধ্যমে বিশুদ্ধ আকীদার বাস্তবায়ন কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে এরশাদ করে বলেন,

﴿ وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخۡتَلِفِينَ ١١٨ ﴾ [سورة هود: 118].

যদি তোমার রব চাইতেন, তবে সকল মানুষকে এক উম্মতে পরিণত করতেন, কিন্তু পরস্পর মত বিরোধকারী রয়ে গেছে, [সূরা হুদ, আয়াত: ১১৮]

এদের বিষয়ে আমাদের রবের কথা বাস্তবায়ন হয় না, তবে যদি তারা ইসলামকে বিশুদ্ধরূপে বুঝতে পারে এবং তারা তাদের নিজেদের, পরিবার পরিজন এবং তাদের আশ পাশে যারা আছে, তাদেরকে সহীহ ইসলামের উপর লালন-পালন করে, তখন আমাদের রবের কথার প্রতিফলন হবে।

কারা রাজনৈতিক কর্ম কাণ্ডের সাথে জড়িত হবেন এবং কখন জড়িত হবেন?

রাজনৈতিক কর্ম কাণ্ডের সাথে জড়িত হওয়া, একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ততা। এটিকে আমরা অস্বীকার করছি না। তবে আমরা একই সময়ে কর্মের ধারাবাহিকতায় বিশ্বাসী। আমরা প্রথমে মানুষের আকীদা ঠিক করার উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকি, তারপর মানুষের ইবাদাত বন্দেগী ঠিক করার উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকি, তারপর মানুষের চাল-চলন ও লেন-দেন ঠিক করার উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমরা যখন এ সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গুরুত্ব দেব, তখন আমরা শরীয়ত সম্মত রাজনৈতিক কর্ম কাণ্ডে জড়িত হতে পারব। কারণ, রাজনীতির অর্থ হল, জনগণের কার্যক্রম পরিচালনা করা। আর এ কাজটি কে করবে? এটি কোন সাধারণ মানুষের কাজ নয়। যায়েদ, ওমর, বকর ও খালেদের কাজ নয়

যে, তারা কোন একটি দল প্রতিষ্ঠা করবে, কোন আন্দোলনের বীজ বপন করবে অথবা কোন জামাতের নেতৃত্ব দেবে। বরং বিষয়টি যারা দেশ ও জাতির অভিবাবক তাদেরই কাজ, যাদের হাতে মুসলিমরা শপথ নেয় এবং তাদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে, তাদের কাজ| এ ব্যক্তিই জানে কীভাবে বাস্তবতার মোকাবেলা করতে হয় এবং জনসাধারণের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। বর্তমান যুগের মত মুসলিমদের মধ্যে যদি ঐক্য না থাকে এবং তারা বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত থাকে, তখন প্রত্যেক ক্ষমতাশীলরা তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী পরিচালনা করবে।

আর আমরা যদি আমাদের নিজেদের এমন কাজে ব্যস্ত রাখি, যে কাজকে আমরা ধরে নিলাম তা আমরা ভালভাবে বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার এ জানা আমার কোন উপকারে আসবে না। কারণ, আমরা তা পরিচালনা করতে ও নেতৃত্ব দিতে সক্ষম নই। কারণ,

আমরা জনগণের পরিচালনার সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা রাখি না। ফলে এটি একটি অনর্থক কাজ যার মধ্যে কোন উপকার নাই।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলব, বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম দেশে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে, তার সমর্থনে জনমত সৃষ্টি করা ও মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করাতে আদৌ কোন উপকার আছে? অথচ আমরা জিহাদ পরিচালনার ক্ষমতা রাখি না। কারণ, জিহাদ পরিচালনা হতে হবে, এমন একজন দায়িত্বশীল ইমামের নেতৃত্বে যার হাতে মুসলিমরা বাইয়াত নিয়েছে। অন্যথায় এতে কোন ফায়েদা নাই। তবে আমরা এ কথা বলি না যে, জিহাদ করা ওয়াজিব নয়! আমরা বলি, জিহাদ ওয়াজিব, কিন্তু তা তার সময় আসার পূর্বেই শুরু করা যাবে না। সুতরাং, আমাদের জন্য করনীয় হল, আমরা আমাদের নিজেদের ও অন্যদের বিশুদ্ধ ইসলাম সম্পর্কে বোঝানো ও তাদের সঠিক তারবীয়ত দেয়া। আর

যদি আমরা মানুষকে স্পর্শ কাতর বিষয়সমূহে ব্যস্ত করে দেই, তাহলে তাদেরকে ঐ দাওয়াত সম্পর্কে জানা ও বুঝার ক্ষমতা থেকে দূরে সরানো হবে, যে দাওয়াতের দায়িত্ব আদায় করা প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের উপর ওয়াজিব। যেমন, আকীদা শুদ্ধ করা, ইবাদাতসমূহ সঠিক পদ্ধতিতে আদায় করা এবং আখলাক সুন্দর করা। মনে রাখতে হবে, এ গুলো হল, ফরজে আইন-যাতে কোন প্রকার দূর্বলতা গ্রহণ করা হবে না। আর অন্যান্য বিষয়গুলো এমন, যেগুলোর কিছু আছে ফরজে কেফায়া, অর্থাৎ কতক লোক এ দায়িত্ব পালন করলে সবার পক্ষ হতে তা আদায় হয়ে যাবে। যেমন, বর্তমানে রাজনৈতিক কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকাকে ফিকহুল ওয়াকে' বলে নাম করণ করা হয়ে থাকে| এর দায়িত্ব হল, যাদের মধ্যে সমসাময়িক সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা আছে তারা এ ধরনের কর্ম-কাণ্ড হতে ফায়েদা লাভ করতে সক্ষম। তবে কতক লোক আছে, যাদের হাতে সমাধানের কোন ক্ষমতা নাই তাদের

জন্য রাজনৈতিক কর্ম কাণ্ড সম্পর্কে জানা, সাধারণ মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে ফিরিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত করা, এমন একটি কাজ যা তাদের সঠিক বুঝ হতে দূরে সরিয়ে রাখে। বর্তমানে এ ধরনের সমস্যা অধিকাংশ ইসলামী দল ও সংগঠনসমূহের কর্ম পদ্ধতির মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাই এবং সরাসরি অনুভব করি। এমনকি আমরা এ সব দাঈদের অনেককেই দেখতে পাই, বিশুদ্ধ আকীদা, ইবাদাত বন্দেগী ও আখলাক শেখার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সম্পৃক্ত ও তাদের আশ পাশে থাকা অনেক মুসলিম যুবককে তারা সঠিক আকীদা শিক্ষাদান হতে বিরত রাখে। অনেক দাঈদের অবস্থা এমন তাদের রাজনৈতিক কর্ম-কাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকা এবং আল্লাহ নাযিলকৃত বিধানের পরিপন্থী সংসদের সদস্য হওয়ার অভিলাষ তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতে বিরত রাখে। ফলে তারা এমন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে যা বর্তমান এ নাজুক পরিস্থিতিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ

বিষয় নয়। বর্তমান করুণ পরিণতির পরিবর্তনের জন্য অংশ গ্রহণ করা অথবা মুসলিমদের দায়িত্ব হতে দায়মুক্তির প্রদ্ধতি সম্পর্কে যে প্রশ্ন করা হয়েছে, সে বিষয়ে আমরা বলব, প্রতিটি মুসলিম তার যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্বশীল। তাদের মধ্যে যারা আলেম তাদের উপর যা ওয়াজিব হবে অন্যদের উপর তা ওয়াজিব নয়। যেমন, এসব বিষয়ে আমরা বলব, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের উপর তার কিতাবের মাধ্যমে নিয়ামতসমূহ পূর্ণ করেন এবং কুরআনকে মুমীনদের জন্য সংবিধান হিসেবে নির্ধারণ করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, ﴿فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٧﴾ [سورة الأنبياء: من الآية 7] "তোমরা জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞাসা কর যদি তোমরা না জান" [সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৭]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামি সমাজকে দুটিভাগে বিভক্ত করে বলেন, এখানে দুই শ্রেণীর লোক আছে, এক শ্রেণীর লোক যারা আলেম আর অপর শ্রেণীর লোক আছে যারা আলেম নয়। আর এ দুই শ্রেণীর লোকের দায়িত্ব এক নয়। একজন আলেমের দায়িত্ব আর যে আলেম নয়, তার দায়িত্ব এক হতে পারে না। যারা আলেম নয় তাদের দায়িত্ব হল, জানার জন্য তারা আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করবে, আর আলেমদের দায়িত্ব হল, তারা তাদের প্রশ্নের উত্তর দেবে। মোট কথা ব্যক্তির ধরনের উপর নির্ভর করে, তাদের দায়িত্বও বিভিন্ন হয়ে থাকে। বর্তমান যুগে একজন আলেমের দায়িত্ব হল, সে তার ক্ষমতা অনুযায়ী মানুষকে সত্যের দিকে দাওয়াত দেবে। আর যে আলেম নয়, তার উচিত হল, তার জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা অথবা যে দায়িত্বশীল তাকে তার স্ত্রী সন্তানরা তাদের অজানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবে। যখন উভয় শ্রেণীর লোক তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব আদায়

করবে, তখন তারা নাজাত পাবে। কারণ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا ﴾ [سورة البقرة: من الآية 286].

“আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাহিরে দায়িত্ব দেন না।” [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬]

আমরা অত্যন্ত দু:খের সাথে বলছি বর্তমানে আমরা এমন এক দূরাবস্থার মধ্যে বসবাস করছি, ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর তা হল, মুসলিমদের বিরুদ্ধে অমুসলিম কাফেরদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ হাদীসে এর ভবিষ্যৎ করে বলেন,

« تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها"، قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟ قال: "لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم لكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن"، قالوا: وما الوهن يا رسول الله ؟ قال: "حب الدنيا وكراهية الموت»

"বিজাতিরা তোমাদের বিপক্ষে একে অপরকে ডাকাডাকি করবে, যেমনটি খাওয়ার দস্তরখানের দিকে একে অপরকে ডাকাডাকি করে, তারা জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! সেদিন কি আমাদের সংখ্যা কম হবে? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম না, সেদিন তোমাদের সংখ্যা কম হবে না, বরং তোমাদের সংখ্যা সেদিন বেশি হবে, তবে তোমরা বন্যার পানিতে ভাসমান খড়-কুটার মত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাদের দুশমনদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয়কে ছিনিয়ে নিবে। আর তোমাদের অন্তরে ওহানকে ঢেলে দেবে। তারা জিজ্ঞাস করল, হে

আল্লাহর রাসূল ওহান জিনিসটি কি? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুর ভয়[13]।

মোট কথা, আলেমদের দায়িত্ব হল, তারা মানুষকে তালীম তরবীয়ত ও সংশোধন করতে চেষ্টা চালাবে। আর এর পদ্ধতি হল, আলেমরা তাদের সাধ্যানুযায়ী মানুষকে বিশুদ্ধ আকীদা, তাওহীদে খালেস, ইবাদাত ও আখলাক শিখাবে। বর্তমান সময়ে আমরা যে সমাজে বসবাস করি আমরা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জিহাদ করার কোন ক্ষমতা আমাদের নাই। কারণ, বর্তমানে আমাদের মধ্যে কোন ঐক্য নাই, আমাদের কোন দেশ নাই যেখানে আমরা একত্র হতে পারি এবং আমাদের কোন ইমাম নাই যার পিছনে আমরা সারিবদ্ধ হতে পারি। কারণ, মুসলিমরা

---

[13] আবু দাউদ ৪২৯৭, আহমদ ২৭৮/৫ হাদিসিটি বিশুদ্ধ আবুদাউদ [৪২৯৭] ছাওবানের হাদিস হতে আর আল্লামা আলবানী উভয় সনদে হাদিসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

তাদের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্রকারী দুশমনদের প্রতিহত করতে যে ধরনের জিহাদ করা দরকার সে ধরনের জিহাদ করতে তারা সক্ষম নয়। তবে তাদের জন্য করনীয় হল, দুশমনদের প্রতিহত করতে শরীয়ত সম্মত যত প্রকার উপায় ও উপকরণ আছে, সম্ভাব্য সব ধরনের উপায় ও উপকরণ অবলম্বন করবে। কারণ, বর্তমানে আমরা বস্তুগত দিক দিয়ে সামর্থ্যবান নই। আর যদি আমরা সামর্থ্যবান হয়েও থাকি, আমরা আমাদের ইচ্ছা মত কোন পদক্ষেপ নিতে পারি না। কারণ, অধিকাংশ মুসলিম দেশে তাদের নিজস্ব প্রসাশন আছে, নেতৃত্ব আছে, বিচারক আছে যা ইসলামী শরিয়তের সাথে সামঞ্জস্যতা বা মিল রাখে না। কিন্তু অত্যন্ত দু:খের বিষয় হল, একটু পূর্বে আমরা যে দুটি বিষয় উল্লেখ করলাম, অর্থাৎ সংশোধন ও তালীম তারবীয়ত তা বাস্তবায়ন করতে পারছি না। যখন মুসলিম দাঈরা যে দেশে ইসলামী শরিয়ত সম্মত বিধি বিধান নাই সে দেশে এ গুরুত্বপূর্ণ দুটি মিশন

নিয়ে কাজ করে যাবে এবং এ দুটি মুলনীতির উপর একত্র হবে, আমার বিশ্বাস তাদের উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বাণীর পুরোপুরি প্রতিপলন দেখা যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿ وَيَوۡمَئِذٖ يَفۡرَحُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ۝٤ بِنَصۡرِ ٱللَّهِۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُۖ ﴾ [سورة الروم: من الآية 4-5].

“আর সেদিন মুমিনরা আনন্দিত হবে, আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন।”

একজন মুসলিমের উপর ওয়াজিব হল, তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাধ্যমত আল্লাহর বিধানের বাস্তবায়ন করা।

সুতরাং মনে রাখতে হবে, মুসলিমের উপর ওয়াজিব হল, তার সামর্থ অনুযায়ী চেষ্টা করা। কারণ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কাউকে তার ক্ষমতার বাহিরে কোন কিছুর দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। এখানে বিশুদ্ধ আকীদা প্রতিষ্ঠিত করা আর বিশুদ্ধ ইবাদাত প্রতিষ্ঠার মধ্যে বাধ্যবাধকতা নাই। অনুরূপভাবে যেখানে আল্লাহর বিধান নাই সেখানে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা ও না করার মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্ব প্রথম আল্লাহর জমিনে যে বিধান বাস্তবায়ন করতে হবে, তা হল, তাওহীদ। তবে এখানে বিশেষ কিছু কাজ বিভিন্ন সময় দেখা যায়, যেমন- একাকীত্ব অবলম্বন করা মানুষের সাথে সংমিশ্রণ হতে অতি উত্তম। একজন মুসলিম কোন নির্জন স্থানে গিয়ে দুনিয়ার

সব মানুষ থেকে দূরে সরে একা হয়ে যাবে এবং সেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত বন্দেগী করবে। দুনিয়ার সব ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকবে, মানুষের অনিষ্টতা থেকে সে বেঁচে থাকল এবং তার অনিষ্টতা থেমে মানুষ বেঁচে থাকল। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে, যদিও সত্যিকার দ্বীন হল, ইবন ওমর রা. হাদীসে যে কথা আসছে, তারই মর্মার্থ। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم »

যে মুমিন মানুষের সাথে উঠবস করে এবং তাদের নির্যাতনের উপর ধৈর্য্য ধারণ করে সে মুমিন উত্তম এমন মুমিন হতে যে মানুষের সাথে উঠবস করে না এবং তাদের কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করে না।

মোট কথা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান কায়েম করার মাধ্যম, তবে তা কোন উদ্দেশ্য নয়। কিছু দায়ীদের কর্ম দেখলে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না, তারা যা করতে পারবে না তার প্রতি খুব গুরুত্ব দেয়। কিন্তু তাদের জন্য যে কাজটি করা সহজ ও যা তাদের করণীয় তা তারা ছেড়ে দেয়। কারণ, এ সব কাজগুলো করতে হলে, তাদেরকে তাদের নফসের সাথে যুদ্ধ করতে হয়। তাই তারা এ সব কাজ ছেড়ে দিয়ে, রাস্তায় নামে দ্বীন কায়েম করার জন্য। যেমন- একজন মুসলিম দায়ী সে তার অনুসারীদের ওসিয়ত করে বলেন, "তোমরা তোমাদের দেহে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম কর, তা হলে তা তোমাদের দেশেও কায়েম হয়ে যাবে"।

তারপরও আমরা দেখতে পাই, অধিকাংশ দায়ীরা এ মুলনীতির খেলাপ করে, তারা তাদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে একমাত্র

বিধান দাতা বলে, আখ্যায়িত করে। তারা এ বিষয়টিকে প্রসিদ্ধ প্রবাদ একমাত্র বিধান দাতা আল্লাহ বলে, চালিয়ে দেন। এতে কোন স:ন্দেহ ও সংশয় নাই যে, একমাত্র বিধান দাতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি একক, এ বিষয়ে এবং অন্য কোন বিষয়ে তার সাথে কোন শরিক নাই। আবার কিছু লোককে দেখা যায়, তারা চার মাযহাবের কোন মাযহাবকে অনুসরন করে, তারা যখন তাদের সামনে স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ সুন্নাতকে তুলে ধরা হয়, তখন তারা বলে, এটি আমার মাযহাবের পরিপন্থি। তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর বিধান অনুযায়ী আমল করার দাবি কোথায়? আবার কতক লোককে দেখা যায়, তারা সুফীদের নিয়মে আল্লাহর ইবাদাত করে থাকে। আল্লাহর রাব্বুল আলামীনের বিধান তাওহীদের উপর আমল করার বিষয়টি কোথায় গেল? তারা অন্যদের থেকে এমন কিছু চায়, যা তারা নিজেরা তাদের নিজেদের জন্য করে না। মনে রাখবে, সর্বাধিক সহজ বিষয় হল,

তুমি আল্লাহর বিধানকে তোমার বিশ্বাস, ইবাদাত, চাল-চলন, তোমার ঘর, তোমার ছেলেদের লালন-পালন, তোমার ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদিতে বাস্তবায়ন করবে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে চলতে অভ্যস্ত, তাদের মধ্যে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা ও তাদের আল্লাহর বিধানের উপর চলতে বাধ্য করা অনেক কঠিন ও দূরহ ব্যাপার। সুতরাং, তুমি কেন সহজটি ছেড়ে কঠিনটি নিয়ে হুড়াহুড়ি করবে?

এতে দুটি জিনিস প্রমাণিত হয়, এক- ভূল শিক্ষা ও অপরিপক্ক নির্দেশনা। অথবা ভূল ধারণা যা তাকে এমন কিছু করতে বাধ্য করে যা তার সামর্থ্যের মধ্যে নাই এবং তাকে এমন কাজ হতে ফিরিয়ে রাখে যা তার সাধ্যের মধ্যে আছে। বর্তমানে একমাত্র আত্মশুদ্ধি, তালীম তারবীয়ত ও মানুষকে সঠিক আক্বীদা এবং ইবাদাত বন্দেগীর প্রতি দাওয়াত দেয়া ছাড়া কোন উপায়

দেখছিনা। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি মানুষ তার যোগ্যতা ও সামর্থ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোন মানুষকে তার সামর্থ্যের বাহিরে কোন দায়িত্ব দেন না।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وآله وسلم . والحمد لله رب العالمين .

সূচীপত্র